IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: ঐতিহ্য, পুনর্নির্মাণ ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

ড. মোঃ সিদ্দিক হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ
১৯, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৯

সারসংক্ষেপ :

বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল কাব্য হিসেবে মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাগবতপুরাণ, গীতগোবিন্দ ও লৌকিক সংস্কৃতি থেকে প্রভাবিত হয়ে রচিত এই কাব্য মানবিক প্রেম ও ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার এক অভিনব সমন্বয়। আধুনিক সাহিত্যিকরা, যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং পূর্ণেন্দু পত্রী, এই কাব্যের ঐতিহ্যকে নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। প্রবন্ধটি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আধুনিক পুনর্নির্মাণ এবং এর প্রাসঙ্গিকতার বিবর্তন বিশ্লেষণ করে। কাব্যের শৈল্পিক বিনির্মাণ এবং সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে এর আবেদন এই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: বড়ু চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গীতগোবিন্দ, পুনর্নির্মাণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, রাধাকৃষ্ণ, আধুনিক সাহিত্য।

ভূমিকা :

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ভাণ্ডারে বড়ু চণ্ডীদাস একটি অনন্য নাম, যিনি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* রচনার মাধ্যমে সাহিত্যজগতে একটি মাইলফলক স্থাপন করেন। এই কাব্য ধর্মীয় ভক্তি ও মানবিক প্রেমের যুগলবন্দি। কালের বিবর্তনে এই কাব্য আধুনিক সাহিত্যিকদের কাছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও উপস্থাপনার প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রবন্ধটি কাব্যের ঐতিহ্যবাহী শিকড়, জয়দেবের প্রভাব, এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর পুনর্নির্মাণকে বিশ্লেষণ করে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—ঐতিহ্য ও প্রাসঙ্গিকতার বিবর্তন :

বাঙালি সাহিত্যের প্রাচীনতম সফল কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন বড়ু চণ্ডীদাস, যিনি একক প্রয়াসে রচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। যদিও তাঁর কাব্যের মূল বিষয় সাবেক কালের গল্প-কাহিনী, কবির অন্তর্দৃষ্টি ও চেতনায় তা একান্ত নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে। মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগেও তাঁর রচনাগুলি প্রাসঙ্গিকভাবে টিকে আছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর নব রূপায়ণ ও সমসাময়িকতার চেতনা:

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' আধুনিক যুগে সমসাময়িক চেতনায় নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *'রাধাকৃষ্ণ'* এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর *'রাধাকৃষ্ণের পদাবলী'* এই পুনর্নির্মাণের উজ্জ্বল উদাহরণ। এই দুই প্রথিতযশা সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদি রূপকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। কাব্যের সামগ্রিক রূপান্তর এবং লোকপ্রিয়তাকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছে।

কাব্য নির্মাণের ঐতিহ্য এবং অনুপ্রেরণা:

যুগে যুগে সাহিত্য সমাজের প্রভাব অনুসারে নবায়িত হয়েছে। এই নবায়ণ কখনও নির্মাণ, আবার কখনও বিনির্মাণের পথে ঘটেছে। *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'*, যা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত, একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এর প্রভাব ভাগবতপুরাণ, প্রাকৃত পৈঙ্গল, জয়দেবের *'গীতগোবিন্দ'* এবং লৌকিক সাহিত্য থেকে উদ্ভূত। জয়দেবের কাব্যের প্রতি বড়ু চণ্ডীদাসের ঋণ কেবল আঙ্গিকগত নয়; বরং তা গঠনশৈলী ও বিষয়বস্তুর গভীরতাতেও অনুরণিত। ড. সুকুমার সেনের মতে,

> "উভয় কাব্যের গঠন ও রচনাশৈলীর মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান, তা বড়ু চণ্ডীদাসের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব স্পষ্ট করে।"

যদিও বড়ু চণ্ডীদাসের লেখায় জয়দেবের সূক্ষ্মতা ও আভিজাত্যের অভাব রয়েছে, তবুও তিনি অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে জয়দেবের জনপ্রিয় পদের অনুসরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, জয়দেবের:

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্"

এর অনুরূপ উচ্চারণ দেখা যায় বড়ুর লেখায়:

"তোর রতি আশো আঁশে গেলা অভিসারে। সকল শরীর বেশ করী মনোহর।"

ভাষান্তর ও ভাবের সেতুবন্ধন:

বঙ্গ সাহিত্যে অনুবাদের সূত্রপাত সম্ভবত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মাধ্যমেই। উদাহরণস্বরূপ, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবন খণ্ডের শেষপদ জয়দেবের:

"বদসিহ যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদি"

এর অনুগত:

"যদি কিছু বোল বোলসি তবে দশনরুচি তোক্ষারে হরে দরুবার ভয়।"

আধুনিক সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি:

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *'রাধাকৃষ্ণ'* গ্রন্থে কাব্যের ঐতিহ্যকে আধুনিক চেতনায় রূপান্তর করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "এই কাহিনীর রচনায় ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনসহ অন্যান্য রচনার উপাদান গ্রহণ করেছি।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিক দিক মুছে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে মানবিক প্রেম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর লেখায় রাধা বিরহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আত্মতত্ত্ব ও যোগসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বড়ু চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত এক বহুমাত্রিক প্রভাব বিস্তার করেছে। জয়দেবের মতো পূর্বসূরীর প্রভাব থেকে উদ্ভূত হয়ে বড়ু চণ্ডীদাস যেমন নিজের কাব্যের ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন, তেমনই আধুনিক সাহিত্যিকেরা তাঁর রচনা থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাব্যকে নির্মাণ ও বিনির্মাণ করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণ বস্তুর কৃষ্ণ' এবং বড়ুর কৃষ্ণের মধ্যে মিল-অমিল সহজেই পরিলক্ষিত হয়। সুনীলের কৃষ্ণ রাধার প্রতি 'নিঠুরবাণী' উচ্চারণ না করে বলেন, রাধা তার হৃদয়ের চিরন্তন সুন্দর প্রতিমা, যাকে

তিনি কখনও ভুলতে পারবেন না। বৃন্দাবনে ফিরে না যাওয়ার বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বড়ুর কৃষ্ণের যোগসিদ্ধির যুক্তিকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছেন। যদিও বড়ুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুরাণীয় প্রেক্ষাপট ও ধর্মীয় শব্দাবলীতে আবৃত, সুনীলের 'শ্রীকৃষ্ণ বস্তুর' কাহিনি রক্তমাংসের মানব-মানবীর প্রেমের এক অনন্য রূপায়ণ।

'রাধাকৃষ্ণ' গ্রন্থে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বিভিন্ন অংশ—দানখন্ড, ভারখন্ড, ছত্রখন্ড, নৌকাখন্ড এবং 'রাধাবিরহ'—অনুকরণ করেছেন। তবে, কাব্যটির আধুনিক নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের ভিন্নমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টত ধরা পড়ে। যুগ যুগ ধরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা লোকগল্প ও ধর্মীয় সাহিত্যে যে ধারা বজায় রেখেছে, সুনীল সেই কাহিনিকে গদ্যের বন্ধনে অমর করে তুলেছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর রচনায় 'শ্রীশ্রীভাগবত,' 'শ্রীশ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,' চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, লোকসঙ্গীত এবং দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের রচনাসমূহ থেকে তিনি যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

লেখকের এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সারমর্ম তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, এই প্রেম চিরন্তন মানবীয় আবেগের প্রতীক। তিনি গল্প থেকে সমস্ত অলৌকিকতা এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারা সরিয়ে দিয়েছেন। তবে একটি অংশ, যা তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে গ্রহণ করেছেন, তা কৃষ্ণের যোগসিদ্ধ অবস্থানকে নির্দেশ করে।

সুনীলের রচনায় দেখা যায়, বৃন্দা ও সুবল মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে আনতে চায়। কৃষ্ণ উত্তর দেন—"আমি মন, পবন, গগনে স্থাপন করেছি। মূল কমলে মধুপান করেছি এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছি। তাই মদনবাণ ছিন্ন না করে পারিনি। আমি নিরন্তর যোগসাধনা করি এবং আমার শরীরে আর বিকার নেই। তবে আমি সেই সুন্দর রাধাকে কখনও ভুলব না।"

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-*এর* একাংশেও কৃষ্ণ রাধার প্রতি নিঠুর ভাষায় বলেন, "আমি দশমীর দুয়ার বন্ধ করেছি। আমি আর সংসারধর্মে যুক্ত নই। আমার দেহ বিকারমুক্ত, এবং আমি যোগসিদ্ধ। তবে রাধা, আমি তোমাকে কখনও ভুলব না।"

এখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃষ্ণ এবং বড়ুর কৃষ্ণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য প্রতীয়মান। সুনীলের কৃষ্ণ রাধাকে চিরন্তনী সুন্দর হিসেবে স্মরণ করেন। অন্যদিকে, বড়ুর কৃষ্ণ, যোগসাধনার এক উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে, রাধাকে 'নিঠুরবাণী' শোনান।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর দানখন্ডেও কৃষ্ণের চরিত্রে একটি বৈচিত্র্য দেখা যায়। মহাদানীর ভূমিকায় কৃষ্ণ রাধার পথ রোধ করেন এবং তাকে নানা প্রশ্ন করেন। এক পর্যায়ে কৃষ্ণ বলেন, "তোমার নাম রাধা, গোকুলে থাকো। কিন্তু তুমি মথুরার পথে আমার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসেছো। আমি মহাদানী, তোমার পসরা পরীক্ষা করব।"

এভাবে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণ' আধুনিক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে মানবীয় আবেগের গভীরতায় তুলে ধরা হয়েছে, যা পুরাণীয় অলৌকিকতা থেকে মুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: আদর্শ ও ব্যতিক্রম :

তুমি যদি মশানের নিকট গিয়ে দান চাও, তবে কেন এই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এখানে অবস্থান করছ? তোমার ক্রোধে নীলপদ্মের মতো চোখ দুটি যেন রক্তপদ্মের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃষ্ণ, মাথায় পাগড়ি, পায়ে কাঁচা চামড়ার জুতা, কোমরে জরির বেল্ট, নকল গোঁফ, আর হাতে তীক্ষ্ণ বর্ষা ধারণ করে মথুরার পথে মহাদানীর ভূমিকা পালন করেন। অথচ রাধা তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করে বলেন, "তুমি তো মর্কট, নারকেল পেলেও তা ভাঙতে পারো না।"

মূল থেকে প্রভাবিত শব্দবন্ধ ও উপমা :

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর একটি প্রবাদের উল্লেখ দেখা যায়:

"মর্কটের হাতে নারকেল, ভাঙতে না পারা তার লজ্জা।"

এটি সুনীল তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। তবু মূল কাব্যের গ্রাম্যতা তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতায় মুছে গিয়ে শিল্পিত উচ্চতায় পৌঁছায়। তাঁর কৃষ্ণ প্রেমিক, রূপমুগ্ধ; কামুকতা বা অভব্যতা তাঁর চরিত্রে নেই।

মূল ও পুনর্গঠিত চিত্রকল্প :

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্যের প্রতি চরম আসক্ত হয়ে শালীনতা অতিক্রম করেন। উদাহরণত, তিনি রাধার দুধ-দই নষ্ট করেন এবং কাঁচুলি ছিঁড়তে উদ্যত হন। তবে সুনীলের লেখায় রাধাই নিজ উদ্যোগে দুধ-দই রাস্তার উপর ঢেলে দেন।

নৌকাখন্ডের চিত্রায়ণেও দেখা যায় একটি সরল অথচ গভীর রূপান্তর। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কৃষ্ণ ভাঙা নৌকায় রাধাকে তুলে ভয় দেখান। সুনীলের বর্ণনায় কৃষ্ণ মাঝির বেশ ধরে নৌকা চালান, রাধাকে প্রার্থনা করেন, আর তাঁর প্রত্যাখ্যান পেলে দুর্দান্ত পণায় মত্ত হন। রাধার অলংকার বিসর্জনের দৃশ্যেও সুনীল এক নতুন মাত্রা যোগ করেন, যেখানে ভয় ও প্রেমের সংঘাত স্পষ্ট।

শিল্পিত সমাপ্তি :

সুনীলের কৃষ্ণের জলে লাফিয়ে পড়া এবং রাধাকে বুকে ধারণের দৃশ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর তীর্থকথার এক নতুন ব্যাখ্যা। সুনীলের কলমে রাধা যেন সাদা রাজহংসী, কৃষ্ণের বুকে ভেসে থাকা এক অলৌকিক অস্তিত্ব। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনেক উপাদান গ্রহণ করলেও তিনি মূলত কাব্যের এক নতুন ভাষ্য তৈরি করেছেন। তাঁর রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্ক গ্রামীণ গীতিকথা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এক শিল্পিত রূপে পরিণত হয়। এখানেই তাঁর সাহিত্যের অনন্যতা।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র যমুনা খন্ড এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের পুনর্নির্মাণ :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গদ্য রচনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর যমুনা খন্ডের দুটি পদের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছেন। এই অংশে রাধা ও কৃষ্ণের বাক্যালাপ রোমান্টিক গভীরতায় পূর্ণ। কৃষ্ণ রাধার রূপ, আচরণ এবং মাধুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলেন, "তুমিই আমাকে পাগল করেছ। কালীয়দহের তীরে সেদিন তোমার চোখের হাসি যেন আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। কেন তোমার এমন পৃথিবী আলোকিত করা রূপ? কেন তুমি আমায় উপেক্ষা করেছ? তোমার এক ঝলক দৃষ্টি আমাকে ভ্রান্ত করেছিল, তোমার প্রতিটি আচরণ যেন আমাকে পাগল করার জন্যই।"

রাধা জবাবে বলেন, "তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার উপস্থিতি আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। ভয়ে আমার কেশ এলিয়ে গিয়েছিল। দৈবক্রমে আমার আঁচল খসে পড়েছিল, তুমিই তখন তা দেখেছিলে। কিন্তু আমার হৃদয়ের কোনো অভিপ্রায় ছিল না তোমাকে বিচলিত করার।"

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য:

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র যমুনা খন্ডে চন্ডীদাস অত্যন্ত গভীরভাবে প্রেমিক কৃষ্ণের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি কৃষ্ণের মানসিকতা এবং রাধার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশে সুনিপুণ। উদাহরণস্বরূপ, যমুনা খন্ডের ৩নং পদে রাধার দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে:

"বাহু তুলিলে কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলে বদন কমলে।"

এই পংক্তিগুলিতে চন্ডীদাস প্রেমের বহিঃপ্রকাশকে রূপক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আধুনিক সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই ভাবনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নিজের রচনায় রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ককে গভীর এবং মানসিক দোলাচলে পূর্ণ করেছেন।

আধুনিক সাহিত্যিকদের পুনর্নির্মাণ: সুনীল থেকে পূর্ণেন্দু পত্রী:

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাবনা থেকে নিজের রচনায় কৃষ্ণকে অস্থির প্রেমিক হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যিনি রাধার প্রতি মুগ্ধ। অন্যদিকে, পূর্ণেন্দু পত্রী 'রাধাকৃষ্ণের পদাবলী' (১৯৯০) কাব্যনাট্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুণর্নির্মাণ করেছেন। তাঁর মতে, "শুধু রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি দেখলে ভুল হবে। এর পুনর্গঠন এবং আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।"

পূর্ণেন্দু পত্রী রাধাকৃষ্ণের কাহিনিকে চিরায়ত রূপ থেকে উত্তীর্ণ করে আধুনিক মানসিকতায় রূপান্তরিত করেছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কেবল রোমান্টিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে এর গভীর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর যমুনা খন্ডে চন্ডীদাসের প্রেমচেতনা আধুনিক সাহিত্যিকদের কাছে নতুন আঙ্গিকে পুনর্নির্মাণের উৎস হয়ে উঠেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং পূর্ণেন্দু পত্রী উভয়েই চন্ডীদাসের রচনাকে নতুন আলোয় উপস্থাপন করেছেন। চিরায়ত ও আধুনিকের মেলবন্ধনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংযোগস্থল হয়ে উঠেছে।

এমন একটি উপাখ্যান' বলতে লেখক যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কে ইঙ্গিত করেছেন, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ মেলে 'রাধাকৃষ্ণের পদাবলী'-র গদ্যাংশে। লেখকের দৃষ্টিতে এটি কেবল রোমান্টিক প্রেমগাথা নয়, বরং এর **পুনর্গঠন** এবং **আধুনিকীকরণ** অত্যন্ত জরুরি। ফলে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সনাতন চেতনার যে ভিন্নতর উপস্থাপনা এখানে ঘটেছে, তা একপ্রকার পূর্বানুমানযোগ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'রাধাকৃষ্ণ-বড়াই'-এর কথোপকথন কেবল সীমাবদ্ধ থাকেনি; কাহিনিতে যুক্ত হয়েছে নতুন চরিত্র ও তীক্ষ্ণ ভাবনার পরিসর।

লেখক তাঁর 'রাধাকৃষ্ণের পদাবলী'-কে পাঁচটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন: 'তৃষ্ণা,' 'অপেক্ষা,' 'কালীদহ,' 'কালীয়দমন,' এবং 'মুক্তি'।

তৃষ্ণা: 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর অনুপ্রেরণা :

'তৃষ্ণা' অংশটি তুলনীয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর **তাম্বুলখণ্ডের** সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বসন্তের চিত্রায়ণ উঠে আসে এভাবে:

"কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধুপী এ।।"

ঠিক অনুরূপভাবে, 'তৃষ্ণা'-তে কৃষ্ণ বলেন:

"সুঠাম ষোড়শী সাজে বসন্তের হারাজো,
সুগন্ধে মাত বাতাস, নিয়ত নৃত্যরত
বড়াই, তোমার কেন ভারাক্রান্ত মুখ?"

বড়াই উত্তর দেয় তার নাতনি চন্দ্রাবলীর কথা উল্লেখ করে, যার রূপের বর্ণনায় কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়। বড়াইয়ের বর্ণনা:

"বর্ষার মেঘের আঁচলের মতো তার কেশ;
সিঁথির সিঁদুর যেন উদীয়মান সূর্যের আলো।"

এখানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর একটি তুলনামূলক পদ:

"কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে।"

এই অংশে কৃষ্ণের রূপতৃষ্ণা চিরায়ত প্রেমের গহন সংকটকে তুলে ধরে, যেখানে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে রাধাকে বার্তা পাঠান।

প্রেমের প্রত্যাখ্যান ও কৃষ্ণের অপেক্ষা :

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর তাম্বুলখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের উপহার প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন:

"নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল
তা সথে কি মোর নেহা।"

ঠিক একইভাবে, 'রাধাকৃষ্ণের পদাবলী'-তে রাধা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন কৃষ্ণের প্রস্তাব:

"ভালোবাসা স্বর্ণলতা,
শুধু এক বৃক্ষকে ঘিরে তার আত্মনির্মাণ।"

এ প্রত্যাখ্যান কৃষ্ণকে করে তোলে অপেক্ষারত, এবং গল্পে যুক্ত হয় তার ব্যক্তিগত কামনার টানাপোড়েন।

কালীয়দমন: পরিবেশ ও ক্ষমতার প্রতীক :

'কালীয়দহন'-এর কাহিনি আধুনিকতাকে স্পর্শ করে। পূর্ণেন্দু পত্রীর পাঠে, কালীয়দহ ক্ষমতার বিষাক্ত দম্ভ ও পরিবেশ দূষণের প্রতীক। সর্পরাজ কালীয়নাগ যে বিষ ছড়িয়েছে, তা কেবল গোকুলবাসীকেই নয়, সমগ্র মানবজাতিকেই বিপন্ন করে তোলে। লেখক এই বিষয়ের মাধ্যমে আধুনিক পরিবেশ সংকট ও ক্ষমতার অপব্যবহারকে তুলে ধরেছেন।

'রাধাকৃষ্ণের পদাবলী'-তে কৃষ্ণ একাধারে কামনা-তাড়িত, প্রেমে প্রতীক্ষারত এবং সমাজের গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি। রাধাও এখানে একাধারে আত্মমর্যাদাসচেতন ও আধুনিক নারীর প্রতীক। এ গ্রন্থ প্রেম ও সংকটকে কেবল আবেগের বাইরে নিয়ে গিয়ে গভীর দার্শনিক ও সামাজিক বাস্তবতার সোপান তৈরি করেছে।

উপসংহার:

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের এক ঐতিহ্যবাহী সৃষ্টি, যা ধর্মীয় এবং মানবিক আবেগের গভীর সমন্বয়। মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন এই কাব্য আধুনিক সাহিত্যিকদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাসূত্র। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকরা এই কাব্যের মর্মার্থ আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন, যা কাব্যের ঐতিহ্যিক রূপ এবং নতুন নির্মাণের এক অনন্য মেলবন্ধন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রমাণ করে, সাহিত্যের প্রকৃত সৃষ্টিগুলি কালের গণ্ডি পেরিয়ে চিরকালীন হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র :

১. বড়ু চণ্ডীদাস. *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*. সম্পাদনা ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৬, পৃ. ২২-২৩, ৫৭, ১৪৮, ১৬৫, ১৭২, ২৩৬-২৩৭, ২৩৯-২৪১, ৩৪৪-৩৪৫, ৩৬৬-৩৬৮।

২. বড়ু চণ্ডীদাস. "বৃন্দাবন খণ্ড." *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*. সম্পাদনা ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৬, ৪নং পদ, পৃ. ২২৩।

৩. বন্ধু চণ্ডীদাস. *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*. সম্পাদনা ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৬, পৃ. ১৪৯, ৩৪৫, ১৬১, ২৩৭।

৪. পূর্ণেন্দু পত্রী. *রাধাকৃষ্ণের পদাবলী*. দে'জ, ২০১৬, পৃ. ৭-১০, ১২-১৩, ১৯, ২৮-২৯, ৩২-৩৪, ৫৫।

৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রী হরেকৃষ্ণ. *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*. দে'জ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৬, ২৪৪।

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. *রাধাকৃষ্ণ*. আনন্দ, ২০১৫, পৃ. ৭০-৭৩, ৭৭-৭৯, ৮৩-৮৬, ২৪৯-২৫০, ৩৭১-৩৭৫।